চতুরঙ্গ থেকে শ্রীবিলাসের ডায়ারি

রামানুজ মুখোপাধ্যায়

সৌন্দর্য আস্বাদনের সাধ সবার থাকে না। শিল্পের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে অবশ্য আস্বার ইচ্ছেটুকুই যথেষ্ট নয়, সাধ্য থাকা চাই। সাধ আর সাধ্যকে এক্ষেত্রে মেলাতে পারে মননের মধুর চর্চা। শিল্পের সৌন্দর্যও তো একরকমের নয়। সাহিত্যের এক-এক সংরূপ আছে নিজের নিজের জগত নিয়ে। Text-এর আবরণ উন্মোচন করতে না পারলে কেমন করে দেখব তার রূপ? না বাপু, আমরা কোনো আধা text/আধো text/প্যারা text-এর কথা বলছি নে। Text মানে ওইটুকুই, যা পড়া যাচ্ছে। ভাঙতে হবে তার আবরণ। কবিতার ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তোলা যায় বটে, কিন্তু গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে? সে তো শেষপর্যন্ত একটা কাহিনিই বলে। সে-কাহিনি কখনো পূর্ণ কখনো ছিন্ন, কখনো স্পষ্ট কখনো আলো-আঁধারিতে ঘেরা। আখ্যানের নানা আলেখ্য তৈরি হয় তাতে। তথাকথিত 'জনপ্রিয়' উপন্যাস যেমন একখান্ জব্বর গপ্পো ফেঁদে বসে, সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না, আমাদের কথাসাহিত্য সমালোচনাও তেমনি, ওই ফাঁদের চারপাশেই ঘোরাফেরা করে। আপাতত এখানেই কথা থামানো যাক, কেননা এ বিষয়ে আর বেশিদূর অগ্রসর হলে মহাজনপল্লিতে আমাদের প্রবেশ, এমনকি ধোপা-নাপিতও বন্ধ হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমাদের আদিখ্যেতার অন্ত নেই। প্রায় বছরে বছরে রবীন্দ্র-সৃষ্টির একটা না একটা শতবর্ষ লেগেই আছে। আজ *গোরা*-র তো কাল *গীতাঞ্জলি*-র, পরশু নোবেলের তো তরশু নাইটের! তাতে রবীন্দ্রচর্চা কদ্দুর অগ্রসর হল? সে প্রশ্ন অবশ্য অলীক আর অবান্তর। 'অনেক তো চর্চাটর্চা হল'— এই বলে আমরা কি তবে আত্মপ্রসাদের ঘোরে সুখে নিদ্রা যাব? এ পথে গেছেন বহু মহাজন, তাঁদের পথ অনুসরণ কর, রে মুর্খ, প্রশ্ন তুলো না— বলবেন আমাদের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক। রাম-রাম, তাঁকে 'মহাপঞ্চক' বললে গালি দেওয়া হয়, এবং তিনি তা বুঝতে পারেন! তাই সমালোচনার মরুতীর্থে উটের সারি চলেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনায় হয়তো প্রথম থেকেই অনেক উত্থান-পতন লক্ষ করা যাবে, কিন্তু রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য-সমালোচনা সাবালক হয়েছে অনেক পরে। কেননা, এগুলিকে 'কবির গদ্য' বলে চিহ্নিত করেই আমরা স্বস্তি পেয়েছি এতদিন। ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ যদিবা মুক্তি পেয়েছেন এর থেকে, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের নিস্তার ছিল না দীর্ঘদিন। বহুলাংশে ব্রাত্য সুখরঞ্জন রায় আর অনেকাংশে বিস্মৃত বুদ্ধদেব বসু ছাড়া,

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প বিষয়ক আলোচনায় তপোব্রত ঘোষের জুড়ি মেলা ভার। দু-দশক আগে প্রকাশিত তাঁর *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ* বইটির উদ্‌গীরণ-পুনরুদ্‌গীরণ হয়েছে বহু, কিন্তু এখনো একে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা হয়নি কারও। রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে যাঁরা নানা সময়ে বাক্‌বিস্তার করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সত্যব্রত দে, অমরেশ দাশ অন্যতম। আমাদের আলোচ্য *চতুরঙ্গ* উপন্যাসটির ক্ষেত্রে অবশ্য সেই তালিকায় যুক্ত হবে কানাই সামন্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রলয় শূরের নাম। রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। তার বছর দুই আগে, ১৩২১ বঙ্গাব্দে, *সবুজ পত্র* পত্রিকার পর পর চারটি সংখ্যায় আলাদা-আলাদাভাবে ছাপা হয়েছিল *জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। চতুরঙ্গ* নামটি ছিল না তখন। প্রাথমিকভাবে চারটি গল্প হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন লেখক। পরিকল্পনা বদলে গেল বই আকারে প্রকাশের সময়, এল উপন্যাসের আদল। *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত হলেও এ আখ্যান সাধু ভাষায় লেখা। বলা ভালো, সাধু ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। এর অভিনবত্ব যে পাঠকের অভ্যস্ত সংস্কারে আঘাত হেনেছিল, তার নানা সাক্ষ্য আমরা পেয়ে যাই এর সমালোচনায়। কেউ একে বলেছেন না-ছোটোগল্প না-উপন্যাস। এটি গদ্যকাব্য না কাব্য উপন্যাস, তা নিয়ে তর্ক উঠেছে। কেউ আবার মুগ্ধ হয়েছেন এর গড়নের নতুনত্বে, চমৎকারিত্বে। এসব আলোচনার মূলত একটাই ঝোঁক : চতুরঙ্গ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শচীশ, তাকেই কেন্দ্র রেখে দেখতে হবে এর আখ্যান-বৃত্তটিকে। উপন্যাসের প্রকাশলগ্ন থেকেই এই ঝোঁক প্রবল। রবীন্দ্রনাথও এ নিয়ে কোনো উচ্চাবাচ্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে সেই গড্ডলিকা প্রবাহে প্রথম আঘাত হানলেন তপোব্রত ঘোষ। তাঁর *শ্রীবিলাসের ডায়ারি* এ-সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল প্রথম। তপোব্রত বললেন, *'চতুরঙ্গ'* উপন্যাসটি আসলে 'শ্রীবিলাসের ডায়ারি', শ্রীবিলাসকেই রাখতে হবে এর কেন্দ্রে। পনেরোটি পরিচ্ছেদ, *পরিশিষ্ট, পুনশ্চ* আর *শেষ কথা* মিলে একশো কুড়ি পৃষ্ঠার বইয়ে তাঁর আলোচ্য একটিই উপন্যাস, *চতুরঙ্গ*। এটিই একমাত্র রবীন্দ্র-উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ নিজে যার ইংরিজি অনুবাদ করেছিলেন। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল সেই অনুবাদে। চরিত্রের নামের পরিবর্তন, বিধবা ননিবালাকে কুমারী করে দেওয়া ছাড়াও ছিল আরও কিছু সূক্ষ্ম তফাৎ। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিপাঠ, পত্রিকাপাঠ, গ্রন্থপাঠের সঙ্গে অনূদিতপাঠকেও প্রয়োজনে তপোব্রত ব্যবহার করেছেন। শুধু পাঠান্তর আর শিল্পরূপগত বিশ্লেষণেই থেমে থাকেনি তাঁর ভাষ্য, সমকালীন কলকাতা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের অনালোকিত এক অধ্যায় উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। উনিশ শতকের সুবর্ণবণিক সমাজের উত্থানের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে হবে বাঙালির ধর্মসাধনার ইতিহাসকে। কোঁতের ধ্রুব দর্শনের বঙ্গীয় রূপ আর সে সময়ের বৈষ্ণব পুনরুত্থানবাদী নবগৌরাঙ্গ আন্দোলনকে মিলিয়ে নিতে হবে এর সঙ্গে। শচীশের উলটো পিঠে শ্রীবিলাসের স্বধর্মলাভের ইতিহাস হিসেবেই এ উপন্যাসকে চিহ্নিত করেছেন তপোব্রত। উপন্যাসের *চতুরঙ্গ* নাম যদি নানা

তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে, তাহলে তার ভাষ্য হিসেবে *শ্রীবিলাসের ডায়ারি* নামটিও কম ব্যঞ্জনাবাহী নয়। *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*-র তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপন্যাসের ঘটনা-পরম্পরা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখাচ্ছেন, এর কাহিনির সময়কাল উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের সূচনালগ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট করে তিনি দেখাচ্ছেন, ১৮৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শ্রীবিলাসের ডায়ারি শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায়। ডায়ারি আকারে লেখা বলে এখানে শ্রীবিলাসের 'আমি'-কে কথক আমি না বলে লেখক আমি বলাই সংগত। এই ডায়ারি লিখনের সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত হয়ে আছে চরিত্রের মনস্তত্ত্বের দিকটি। শচীশের ডায়ারি যে শ্রীবিলাস প্রায় নিয়মিত পড়ত, তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বহু প্রমাণ এ-উপন্যাসে আছে। নিশ্চয় শচীশের অনুমতি না নিয়েই শ্রীবিলাস পড়ত সে ডায়ারি। প্রয়োজনে সেখান থেকে অকপটে উদ্ধৃতিও দিতে পারে সে। অন্য ঘটনাগুলি দামিনীর মুখ থেকে তার শোনা। ডায়ারি লেখার সময় শচীশ আর দামিনীর ভাষ্যের উপর ভর করে আশ্চর্য এক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে শ্রীবিলাস, মোক্ষম সময়ে আড়ালে রাখতে পারে নিজেকে। এ উপন্যাসকে 'ডায়ারি' বলা যাবে কিনা এ নিয়ে তর্ক তুলতে পারেন কেউ কেউ। ডায়ারি না বলে স্মৃতিকথাই কি বলব না একে? মূল উপন্যাসেই ডায়ারি লেখার একাধিক সাক্ষ্য আছে, তপোব্রত সযত্নে উদ্ধার করেছেন সেগুলি। এখানে 'ডায়ারি'-কে সংরূপ হিসেবেই নিতে হবে। চিঠিকে যদি সংরূপ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে ডায়ারির ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি কেন? ডায়ারি বিষয়ে চলতি ধারণা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ডায়ারি ভাবনাকে কিভাবে বিচার করব আমরা? *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তপোব্রত সে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হতে পারত। আশা রাখি, তিনি এ তর্কের একটা সংগত ইতি টানবেন পরের সংস্করণে।

একটি উপন্যাসের প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি বাক্য যে নিবিড়, তন্নিষ্ঠ দৃষ্টিতে তপোব্রত দেখতে চেয়েছেন বাংলা কথাসাহিত্য সমালোচনায় তা দুর্লভ। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-যোগমায়া, কড়ি খেলা-দাবা খেলা, চিল-বেজি, গুহার উল্লিখনকে তিনি যেভাবে পড়তে চেয়েছেন, বাংলা উপন্যাসপাঠ অভ্যস্ত নয় তাতে। তপোব্রতর লেখার আরও একটি দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের। কখনো তিনি ঐশ্বরিক দূরত্ব থেকে কথা বলেন না পাঠকের সঙ্গে। অনায়াসে তাঁর সঙ্গে তর্ক করা যায়, কথাবার্তা চালানো যায়। পাঠককে মোহগ্রস্থ, স্থানু করে রাখার কোনো প্রবণতা তাঁর মধ্যে নেই। পাণ্ডুলিপিপাঠকে এত অব্যর্থভাবে অনুসরণ করার পরেও, আমরা দেখেছি, এখনো অনালোকিত রয়ে গেছে দু-এক টুকরো অংশ। পাণ্ডুলিপির ছোটো-ছোটো পাঠ পরিবর্তন চরিত্রের আরও গভীরে আলো ফেলতে সাহায্য করবে আমাদের। দামিনীকে দেওয়া বিবাহপ্রস্তাবের যে অংশটিকে ('আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি ত আমাকে জান। আমি বলিলাম, তুমিও আমাকে জান।') আমরা ভেবেছি তুলনাহীন, সে তো পাণ্ডুলিপিতে পরবর্তী সংযোজন। দামিনী শ্রীবিলাসের দাম্পত্যে যাকে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক মনে করেছি, তাকে যে কত সযত্নে

নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার বহু সাক্ষ্য আছে পাণ্ডুলিপির পাতায়। এ কথা যেমন সত্য, তেমন এও সত্য যে, অনেক প্রশ্নের সমাধানও আমাদের হাতের কাছে নেই। পাণ্ডুলিপিতে শ্রীবিলাস লিখেছে : 'গুরুজি ইহাও জানেন ভক্তির জাল দিয়া এই বন্যমৃগীটিকে তিনি বাঁধিতে পারেন নাই'। দামিনী 'বন্যমৃগী'? ভাষার এই অলংকরণ সুন্দর, কিন্তু একে সরল মনে করার কোনো কারণ আছে কি? এ নিয়ে আমরা খানিকটা দ্বিধায় থাকি মাত্র।

শ্রীবিলাসের ডায়ারি গ্রন্থে তপোব্রত যখন এই প্রশ্নগুলি তোলেন— 'শ্রীবিলাস আর রবীন্দ্রনাথ খানিকটা অভিন্নসত্তা বলেই কি চতুরঙ্গ-র এই শেষপালাটি উদ্‌যাপিত হয়েছে এক নীলকুঠির দেশে?' 'শ্রীবিলাস কি বলাকা পর্বের রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ দোসর'?— তখন স্বাভাবিক স্থৈর্য থেকে পাঠককে খানিকটা নড়েচড়ে বসতে হয়। শচীশের যৌন অবদমনের মূলে আছে একটা যৌনভয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শচীশ 'ছোটো ছেলে' রয়ে গেল— পরিণতমনস্ক হতে পারল না। তার ধর্মবোধের, এমনকি মনুষ্যত্ববোধেরও কোনো উদ্‌বোধন ঘটল না। এইসব অভিনিবেশ পাঠকের ভাবনাকে বহুদূর বিস্তারে নিয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথও কি 'শেষপর্যন্ত সবচেয়ে আত্মস্থ হয়েই সবচেয়ে নিঃসঙ্গ' নন? *চতুরঙ্গ* উপন্যাস 'পা'-এর পুনরাবৃত্ত মোটিফটির কথা তপোব্রতর আলোচনায় অনন্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেও আমরা বলতে পারি, শঙ্খ ঘোষের দামিনীর গানকে এরপাশে বড়ো ম্লান মনে হয়। ভাবতে অবাক লাগে, *দামিনীর গান*-ও এই কাছাকাছি সময়ের লেখা! সমগ্র *চতুরঙ্গ* উপন্যাসটি জুড়ে আগুনের অজস্র ছবি আছে। সেই ছবিগুলি কি ঠাঁই পেতে পারত না তপোব্রতর বিবেচনায়? আরেকটি বিষয়কে এবার আমরা সামনে আনতে চাই। শ্রীবিলাসের ভিতরে একটা রাবীন্দ্রিক আদল দেখতে পেয়েছেন তপোব্রত। এই মন্তব্যের সূত্র ধরেই কি আমরা *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে মৃতুশোকের প্রসঙ্গগুলিকে পুনর্বিবেচনা করতে পারি না? জ্যাঠামশাই আর ননিবালার মৃত্যুকে নিজের জীবনে গ্রহণ করতে পারেনি শচীশ। নিজের ডায়ারিতে সে যা-ই লিখে থাকুক, মৃত্যুশোক শচীশের জীবনকে গড়ে তুলতে পারেনি, উলটে তাকে করে তুলেছে জীবন-পলাতক। অন্যপক্ষে, জ্যাঠামশাই আর দামিনীর মৃত্যুই শ্রীবিলাসের জীবনকে করে তুলেছে শুদ্ধ, পরিণত। গ্রন্থাকারে *চতুরঙ্গ* উপন্যাসটিকে এখন যেখানে শেষ হতে দেখি আমরা, পাণ্ডুলিপিতে তারও পরে ছিল কিছুটা বিস্তার। সেখানে দামিনীর মৃত্যুর পর শ্রীবিলাস লিখেছে : 'এখন আমাকে যাইতে হইবে শচীশের কাছে। মৃত্যুর সঙ্গে মিল রাখিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিতে হয় সে সন্ধান সে পাইয়া থাকিবে।' লেখার পরে অবশ্য কেটে দেওয়া হয়েছে এই কথাগুলি। লিখেও তবে কেন কেটে দিতে হল এই অংশটি? শ্রীবিলাসের জীবন আর ডায়ারির সঙ্গে সমাপ্তিটা স্ববিরোধী হয়ে যাবে বলে? আমাদের মনে পড়বে, যে *বলাকা*—পর্বের সৃষ্টি এই উপন্যাস, সেখানেই তো আছে 'ছবি' কবিতাটি। আরো কিছু উদাহরণও আমরা তুলে আনতে পারি রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে।

১৯১৬ সাল থেকে প্রায় দীর্ঘ আট দশক ধরে কার্যত একই ধরনে *চতুরঙ্গ* উপন্যাসটিকে পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন সাধারণ থেকে অসাধারণ সমস্ত স্তরের পাঠক। তপোব্রত ১৯৯৮-এ এর পাঠকে একেবারে আমূল উলটে দিলেন। যা ছিল মূলত শচীশের উপন্যাস, তা এক লহমায় হয়ে উঠল শ্রীবিলাসের। এ-বদল নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। ১৯৯৮ সালটিকে মাঝখানে রেখে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, *চতুরঙ্গ* সমালোচনা ভাগ হয়ে গেল দু-টি অর্ধে। দেড় দশক ধরে তপোব্রতর *চতুরঙ্গ* ভাষ্যকে আমরা গ্রহণ করেছি, উদ্গীরণ করেছি, কিন্তু স্বীকার করিনি। এর একটা সহজ দৃষ্টান্ত হতে পারে অমরেশ দাশের *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ণ* বইটি। সুখপাঠ্য এই বইটি স্বাবলম্বী চিন্তার জোরেই দীর্ঘদিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অমরেশের এই বইটির প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ বঙ্গাব্দে। এর 'পরিমার্জিত সংস্করণ' প্রকাশ পেয়েছে ২০০২-এর এপ্রিলে। স্বাভাবিকভাবেই *চতুরঙ্গ* বিষয়ে অমরেশের বক্তব্যও পরিবর্তিত হয়েছে। আগে যে পাঠ ছিল একেবারেই শচীশ কেন্দ্রিক, পরিমার্জনের ফলে নড়ে গেছে তার কাঠামো। ২০০২-এ এসে তাই একইসঙ্গে তিন বলছেন— 'উপন্যাসের প্রধান পুরুষ শচীশ, আর 'উপন্যাসটা আসলে শ্রীবিলাসের ডায়ারি।' এই দ্বিতীয় কথাটির কোনো হদিশ অমরেশের বইয়ের প্রথম প্রকাশে ছিল না। ১৩৯০-এর প্রথম প্রকাশের সঙ্গে ২০০২-এর সংস্করণকে মিলিয়ে পড়লে অমরেশের এ-সব বলার পর তপোব্রত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন :

'বস্তুত সাত্ত্বিকতা আর জড়তাকে বাইরের দিক থেকে দেখতে অনেক সময়ে একইরকম লাগে বলে অনেক সময়ে জড়তাকেই সাত্ত্বিকতা বলে ভুল হয়। শচীশ সম্পর্কে পাঠকের ভুলও ঠিক এইরকম।'

শচীশ সম্বন্ধে শ্রীবিলাসের বক্রোক্তিগুলিকে তিনি অনায়াসেই চিনিয়ে দিতে পারেন। আমরা দেখি, ঘটনা-পরম্পরায় শ্রীবিলাস যে পরিমাণে শচীশ সম্বন্ধে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই পরিমাণেই শচীশ সমগ্র উপন্যাসের পক্ষে হয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনীয়। শ্রীবিলাসের রাজনৈতিক বোধের স্বাতন্ত্র্য, বিশেষ মানুষটিকে ভালোবেসে নির্বিশেষ সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, তাঁর নিরহঙ্কার প্রেমের শ্রী আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ মূলত দাম্পত্য সংকটেরই কথাশিল্পী। তপোব্রত লিখেছেন, 'বাস্তবের সমস্ত দায়কে স্বীকার করে নিয়েই দাম্পত্য যে একটা আর্ট তা অমিতের চেয়ে শ্রীবিলাস অনেক আগে অনেক সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে।' শ্রীবিলাসের এই মূর্তি আঁকতে না পারলে তো দামিনীর অমন 'অধিকারূঢ়' সৌন্দর্য আমাদের কাছে কোনোদিন প্রকট হত না। শচীশ কি শেষপর্যন্ত কোথাও পৌঁছতে পারে? জীবনে কারও সঙ্গেই তবে তৈরি হয় না তার কোনো আত্মিক যোগ? না জ্যাঠামশাই, না লীলানন্দ, না দামিনী, না শ্রীবিলাস। নিজের সঙ্গেও কি তার তৈরি হল নিজস্ব কোনো বোঝাপড়া? দামিনী শ্রীবিলাসের সঙ্গে শচীশ আর তাই ফিরতে পারে না জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। তপোব্রত যখন বলেন, ননিবালা আত্মহত্যা করেছিল বলে শচীশ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে ফিরতে ভয় পায়, তখন সে বক্তব্যকে আমরা

মেনে নিতে পারি না সহজে। চৈত্রে শ্রীবিলাসের বিয়ের আয়োজনকেও খুব স্বাভাবিক ভাবতে পারিনি আমরা।

শ্রীবিলাসের ডায়ারি বইটির গড়ন বেশ অদ্ভুত রকমের। পর-পর পনেরটি পরিচ্ছেদ, তারপর *পরিশিষ্ট, পুনশ্চ, শেষকথা*। প্রথম প্রকাশের এই গড়নকে প্রথম সংস্করণে বদলাননি তপোব্রত। বইটি লেখার ইতিহাসটুকুও আমরা এর মধ্যে পেয়ে যাই। এ-বইয়ের কয়েকটি সিদ্ধান্ত সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠের পক্ষেই সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। এবার তাহলে দু-একটা টুকরো উদ্ধৃতির দিকে আমরা ফিরে তাকাই :

ক. 'চতুরঙ্গ উপন্যাস বলাকা-পর্বের সৃষ্টি। শচীশকে পরিত্যাগ করে শ্রীবিলাসের স্বধর্মলাভের মধ্যেও কি এই দিক পরিবর্তনের নিগূঢ় ইতিবৃত্ত প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে? শ্রীবিলাস কি বলাকা-পর্বের রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ দোসর?'

খ. 'নিজের ধর্মকে নিজের মধ্যেই পেতে হয়, তা তো আর কারোর হাত থেকে পাওয়ার জো নেই— শ্রীবিলাস তাই শেষপর্যন্ত সবচেয়ে আত্মস্থ হয়েই সবচেয়ে নিঃসঙ্গ।'

গ. *'চতুরঙ্গ*'র স্ব-কৃত ইংরেজি অনুবাদও কি রবীন্দ্রনাথের সেরকমই একটি প্রয়াস? নিজের বহুবিজ্ঞাপিত শচীশমূর্তিকে ভেঙে চুরমার করে বৃহত্তর পাঠকসমাজের সামনে নিজের অন্তর্নিহিত শ্রীবিলাসমূর্তির উন্মোচন?'

পরিমার্জন আমাদের অবাক করে দেবে। আপত্তির কারণটি অবশ্য সেখানেও নেই। আমরা একেবারে বিস্মিত হয়ে যাই, যখন দেখি, অমরেশ তাঁর বইয়ে কোথাও *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*-র উল্লেখটুকু পর্যন্ত রাখেন না। নিজের কাছে সৎ থাকার কোনো দায় এখন আর বোধ হয় আমাদের নেই। তাই এ-সব কাজের তালিকাই দিনে দিনে দীর্ঘ হতে থাকে।

বিগত দেড় দশকে *শ্রীবিলাসের ডায়ারি* বইটির কোথাও কোনো রিভিউ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। পাঠক হিসেবে এও কি এক অর্থে আমাদের অক্ষমতারই চরম নিদর্শন নয়?

ঋণ : রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতী, অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মন্ডল

শ্রীবিলাসের ডায়ারি। তপোব্রত ঘোষ। ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৪, জানুয়ারি ১৯৯৮। প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৪১৪, জানুয়ারি, ২০০৮। ৬০ টাকা।